সবুজের অভিযান

সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

বর্ষ : ২ সংখ্যা ৬ মার্চ-জুন, ২০১০ দাম ২ টাকা

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার বিধি ও নিধি

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

রাতভোর বৃষ্টি। মাঝে মাঝে থামছে। আবার আসছে। মেঘের মধ্যে চাঁদ প্রায় নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। এরই মধ্যে একটু বৃষ্টি থামতে হঠাৎ মাঠ ভর্তি হ্যারিকেনের আলো। অনেক লক্ষ করলে বোঝা যায় হাঁটুর উপর ধুতি তুলে বা কোনরকমে কৌপিনের মত এক বস্ত্র পরিধান করে কিছু লোক হ্যারিকেন হাতে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ দৃশ্য গ্রামের বহু জায়গাতেই দৃশ্যমান ছিল বা আজও দেখা যায়। কিন্তু কেন এই মানুষগুলো বৃষ্টির জলে ভিজে মাঠের জলের মধ্যে হ্যারিকেন হাতে ঘুরে বেড়াত? কারণ একটাই, ওরা ব্যাঙ ধরছে। ব্যাঙ ধরলেই পয়সা, ভারতবর্ষের মাটি থেকে টিন ভর্তি ব্যাঙ বিদেশে গিয়েছিল আর কিছু লোক উৎফুল্ল হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রা আসছে বলে। গ্রামের মানুষ খেয়ে না খেয়ে এক টাকা থেকে আট আনা পয়সার লোভে ক্রমাগত ব্যাঙ ধরে চালান করেছে। এই ব্যাঙ চালান মাঠের জীববৈচিত্র্যকে খান খান করে দিয়ে গেল। ব্যাঙেরা পোকা খেত। ব্যাঙকে খেত সাপ। কিন্তু ব্যাঙ চলে যাবার জন্য পোকা খাওয়ার জন্য কেউ থাকল না। ফলত পোকা মারতে এল রাসায়নিক কীটনাশক। আর এই কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাঠ থেকে মুছে গেল সকলরকম জীববৈচিত্র্য। তার মধ্যে মারা পড়ল সাপ, ইঁদুর ও বহু ধরনের ধান খেতের মাছ।

গঙ্গার ধার ঘেঁষে; বা সুন্দরবনের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে এমনকী বাচ্চারাও হাতে একটি ছোট জাল নিয়ে নেমে পড়েছে মাছ ধরতে। কূলের কাছে কোন বড় মাছ থাকে না। তবে কী ধরছে? ছোট ছোট চিংড়ির বাচ্চা যা আট আনা থেকে খুব বেশি হলে বারো আনায় বিক্রি হবে অপরের কাছে, আর এই চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরতে জালে উঠে আসে অসংখ্য গেঁড়ি-গুগলিসহ অন্যান্য মাছের পোনাও। সুতরাং তারা অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া হবে। এই একই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বছর নদীর পাড়গুলিতে হাজার হাজার নবজাত প্রজাতির হত্যালীলা চলছে।

পাঁচতারা হোটেলে হাঙরের ডানার স্যুপ এক বিশেষ উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত। এই খাদ্যের ডিশের রসনা মেটাতে জীববৈচিত্র্যের পরিণতি কী হচ্ছে সে ব্যাপারে একটু চোখ ফেরাতে হয় দিঘা, শঙ্করপুর বা বকখালি সমুদ্রতীরে জেলেদের জালে। অসংখ্য ছোট ছোট হাঙর উঠছে, কাটা হচ্ছে তাদের ডানা। এই ডানা কাটা হাঙর পড়ে থাকছে সমুদ্র সৈকতে অথবা চপ-কাটলেট হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে খাবারের ডিশে। এই প্রক্রিয়ায় চলছে অসংখ্য হাঙরের হত্যালীলা।

২০১০ অন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্যের বছর হিসাবে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত হয়েছে। ওপরের ঘটনাগুলি জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের বা বাস্তুতন্ত্রের করুণ পরিণতির এক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে। খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে। আমরা এক নির্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দেখছি বা কোন অভিযোগ শুনলে ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির মত বলছি 'সব ঝুট হ্যায়'। পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা অব্যাহত। ১৯৭২ সালে ষ্টকহলমে গৃহীত ভাল ভাল উপদেশ উড়িয়ে দিয়ে আমরা চলেছি বাস্তুতন্ত্র হত্যার ক্রমান্বয় ইতিহাস রচনায়। রাচেল কারসনের 'নির্বাক বসন্ত' নিয়ে কিছু ঠাণ্ডা ঘরে সেমিনার হলেও তা আত্মস্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' যে আজও ব্রাত্য। দেখা যাক ভারতবর্ষের আইনি দরবারে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে কী আইন আছে।

ভারতবর্ষের বিপুল জীব সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ২০০২ সালে জীববৈচিত্র্য আইন হয়। জীববৈচিত্র্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত পরম্পরা জ্ঞানের দ্রুত ক্ষয় ও যথাযথ লভ্যাংশ ছাড়া জীব ও তার জ্ঞান সম্পদের বৈদেশিক ব্যবসায়িক ব্যবহার রুখতেই জাতীয় স্তরের এই আইন। জীববৈচিত্র্য আইন রূপায়নের জন্য তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ, রাজ্য স্তরে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব হল রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও তার সুস্থিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান ও তা রূপায়নে সরকারকে সাহায্য করা। এছাড়া জীব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার অথবা সমীক্ষা বিষয়ে কোন ভারতীয় নাগরিকের অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করা ও রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য আইনের (২০০২ ধারায় যা কিছু করণীয় কর্তব্য তা পালন করা।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করেছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ নথিকরণ করতে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরম্পরা লব্ধ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞানের নথি বা জনজীববৈচিত্র্য নথি তৈরি করার কাজ এই পর্ষদ শুরু করেছে।

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন

জীববৈচিত্র্য নিয়মাবলি, ২০০৪-এর ২২ নং নিয়মানুসারে, 'জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি' গঠনের পদ্ধতি :

১। প্রত্যেক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি একজন প্রধান বা চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৬ জন অন্যান্য সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সভাপতি / চেয়ারম্যান এই সদস্যদের মনোনীত করবেন, যার ১/৩ অংশ মহিলা এবং ১৮ শতাংশ তপসিলি জাতি/উপজাতির সদস্য থাকবে।

● স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান বা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাস্টিং ভোটাধিকার থাকবে।

● প্রত্যেক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ৩ বছর।

● সমিতির সভায় স্থানীয় বিধানসভার সদস্য এবং স্থানীয় লোকসভার সদস্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হবেন।

● জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণ বা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আগ্রহী ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও এই সমিতির 'বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য' হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

● জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠনের পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সভাপতি/চেয়ারম্যান) ওই সমিতির গঠন সম্পর্কে পর্ষদকে জানাবেন এবং সমিতির পরবর্তী কার্যসূচি সম্পর্কে পর্ষদের পরামর্শ চাইবেন।

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কাজ

● জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির প্রধান কাজ হল স্থানীয় মানুষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে 'জনজীববৈচিত্র্য নথি' (People's Biodiversity Register) প্রস্তুত করা। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য, তাদের ওষধিগুণ বা অন্যান্য ব্যবহার সমন্বিত প্রাচীন জ্ঞানের তথ্য এই নথিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

● জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি এই নথির স্বত্বাধিকারী।

● স্থানীয় জীবসম্পদ ও সেই সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের জন্য যে সকল অনুমোদন মঞ্জুর করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ, ফি সংগ্রহের (Levy) বিবরণ এবং প্রাপ্ত লাভ ও লভ্যাংশ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য সমন্বিত একটি রেজিস্টার সমিতির কাছে রাখতে হবে।

● সমিতি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ স্থানকে 'Biodiversity Heritage Site' হিসাবে ঘোষণা করার জন্যে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদকে সুপারিশ করতে পারে, যার দেখভালের দায়িত্ব সমিতির হাতে ন্যস্ত থাকবে।

● রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের পরামর্শক্রমে ও কারিগরি সহায়তায়, সমিতি অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করবে।

● একটি নির্দিষ্ট সময় (২-৩ বছর) অন্তর জনজীববৈচিত্র্য নথি পুনর্বিবেচনা করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তিত তথ্য নথিবদ্ধ থাকবে।

● অঞ্চলের জীবসম্পদ, তাদের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষের সচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট হবে।

● রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের কারিগরি সহায়তায়, সমিতি জার্মপ্লাজম ও বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় স্বাভাবিক ও কৃষিজ সম্পদ সংরক্ষণ করা যাবে।

● সমিতি স্থানীয় দেশজ চিকিৎসক ও তাদের দ্বারা ব্যবহৃত জীবসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য রাখবে।

● এছাড়া সমিতি জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত জীবসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে আবেদন অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করে মতামত জানাবে।

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কাজ

● প্রত্যেক সমিতির নিজ নিজ এলাকার জীবসম্পদ ও সেই সম্বন্ধীয় প্রাচীন জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।

● পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য নিয়মাবলী, ২০০৫ এর ১৭ নং নিয়মের সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবসম্পদ সংগ্রহ ও সেই সম্পর্কিত কার্যকলাপের উপর রাজ্য পর্ষদের অনুমতিক্রমে সমিতি বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে ১৭ নং নিয়মাবলী প্রযোজ্য :

- বিপন্ন প্রজাতি (Endangered Taxa)
- দুষ্প্রাপ্য বা ওই স্থানেই সীমাবদ্ধ প্রজাতি (Rare of endemic species)
- সেই সব জীবসম্পদ, যার অভাবে ওই জায়গার মানুষের জীবনজীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- যে সব জীবসম্পদের সংগ্রহ ও ব্যবহার সেই অঞ্চলের পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে।
- সেই সব কার্যকলাপ যার ফলে অঞ্চলের জিনগত অবক্ষয় হতে পারে।
- যার প্রভাবে ওই অঞ্চলের সার্বিক জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- জাতীয় স্বার্থ বিরোধী।

● ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যদি জীবসম্পদ সংগ্রহ করেন, তবে সমিতি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ মূল্য (Levy) আদায় করতে পারে।

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির কর্তব্য

● প্রতিটি সমিতি 'স্থানীয় জীববৈচিত্র্য তহবিল' গঠন করবে (সমিতির নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট)।

● এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব যুগ্মভাবে সমিতির সভাপতি ও অপর এক সদস্যের হাতে থাকবে।

● সমিতির সভাপতি প্রত্যেক আর্থিক বছরের হিসাব-নিকাশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন। (জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী)।

● সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য জেলাশাসকের কাছে জমা দিতে হবে (জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২ এর ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী)।

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

স্থানীয় জীববৈচিত্র্য তহবিল

স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সমিতি দ্বারা গঠিত জীববৈচিত্র্য তহবিলের অর্থসংস্থান নিম্নলিখিত উপায়ে হতে পারে।

- রাজ্য সরকারের মারফত অর্থসাহায্য বা ঋণ।
- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের অর্থসাহায্য বা ঋণ।
- জীবসম্পদের ব্যবসায়িক কারণে ব্যবহার থেকে আদায়কৃত সংগ্রহ মূল্য (Levy)।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আরও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া অর্থ।

এই তহবিলের অর্থ স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, তার উন্নয়ন এবং জীবসম্পদের সাথে যুক্ত স্থানীয় মানুষের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যবহার করতে হবে।

ভারতবর্ষে পরিবেশ আইনের ব্যাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, আইনের সুচারু প্রয়োগ কতদূর বিস্তৃত। আসুন, জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে আইনকে মান্যতা দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

দূষিত গঙ্গা : সঙ্কটে প্রাণ

মানসপ্রতিম দাস

গঙ্গা নদী সম্পর্কে বাংলায় যখনই কোনও সঙ্কলন বেরিয়েছে তখনই খুঁজে দেখতে চেয়েছি যে তাতে গঙ্গার জীববৈচিত্র্যের কথা আছে কিনা। এখানে 'সঙ্কলন' বলতে অবশ্য জনপ্রিয় সঙ্কলন-ই বোঝাতে চাইছি। বিশেষ কোনও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নম্বর দেওয়া ভল্যুমের কথা বলছি না। তা সেই সব জনপ্রিয় সঙ্কলনের জীববৈচিত্র্য মোটামুটিভাবে ব্রাত্য বিষয় হয়েই থাকে। হতে পারে যে এমন সব সঙ্কলনের পরিকল্পনা যাঁরা করেন তাঁরা গল্প কবিতা-গান-নাটক ইত্যাদির বাইরে জীবনের আর কোনও রস খুঁজে পান না। ফলে গঙ্গার দু'পাড়ের মনুষ্য জীবনের জন্য তাঁরা প্রচুর পাতা বরাদ্দ করলেও গঙ্গার নিজের প্রাণী উল্লেখ করতে গিয়ে ওই সুস্বাদু ইলিশেই আটকে যান। এতে কিছুটা আমোদ হয় বটে তবে তেমনভাবে তথ্য পরিবেশন হয় না। এই নিবন্ধের সামান্য পরিসরে আমরা ইলিশের প্রতিবেশীদের কথাও একটু জানার চেষ্টা করব।

গঙ্গা নদীর ডলফিন দিয়েই শুরু করা যাক। আমরা বলি শুশুক। এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম প্লাটানিস্টা গ্যাঞ্জেটিকা। এরা অবশ্য শুধু গঙ্গার নিম্নবঙ্গীয় অংশ হুগলি-তেই যে পাওয়া যায় তা নয়। পূর্বভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের অনেক নদীতেই এদের দেখা মেলে। ফলে মেঘনা, কর্ণফুলি বা ব্রহ্মপুত্রেও যাতায়াত আছে এদের। আবার সিন্ধু নদীর বিস্তৃত জলজালেও বাস এই শুশুকের। এমনকী বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা বরাবরও নাকি দেখা গেছে এদের। তাপমাত্রার তারতম্য বেশ ভালোই সহ্য করতে পারে শুশুক। গবেষকরা দেখেছেন আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ব্যবধানেও এদের অসুবিধা হয় না। জলের মধ্যে নড়াচড়া তিন মিটার থেকে ন' মিটার গভীরতায়। তবে কয়েক মিনিট অন্তর বাতাসের জন্য উঠে আসে জলের তলে। (animaldiversity.unmz.umich.edu) সে সময় দেখতে বড় ভাল লাগে এদের। তবে নেহাতই ভাল লাগা পেরিয়ে এদের শরীরের বা তেলের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছে মানুষ। তাতেই বেশি করে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে এদের। শুশুকের শরীরের তেল দিয়ে ওষুধ বানান জড়িবুটিওয়ালারা। শুশুককে প্রাণে না মেরে সে তেল আর কীভাবেই বা সংগ্রহ করা যায়! এই চক্করেই চিনে বাঘের বংশ নির্বংশ হয়েছে। বাঘের হাড় থেকে তৈরি ওষুধ নাকি সর্বরোগহর, যৌবন ধরে রাখতে পারে। এদিকে শুশুকের তেল দিয়ে বিশেষ ধরনের কইমাছ আকর্ষণ করে আনা যায় বলে বিশ্বাস। শুশুকের মাংসও নাকি মাছকে লোভ দেখানোর ব্যাপারে খুব কার্যকরী। ম্যাকডোনাল্ড, নরিস, মরিনো প্রভৃতি গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে অন্য যে কোনও মাছের দেহের অবশেষ যতটা মাছের ঝাঁক আকর্ষণ করতে পারে, শুশুকের মাংস তার থেকে বেশি কখনোই পারে না। এ ব্যাপারে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সচেতন করা উচিত বলে তাঁদের অভিমত। বিপন্নতার এই বিশেষ কারণের পাশাপাশি মনুষ্যবসতির চাপও রয়েছে। নদীর দু'পাড়ের বসতি অঞ্চল থেকে নদীতে মিশছে দূষিত পদার্থ। চাষের খেত, শিল্প কারখানা বা অন্যান্য উৎস থেকে। ভারী ধাতু বা অর্গানোক্লোরাইড্স মিশে শুশুকের বাসস্থানকে বাসের অযোগ্য করে তুলছে। জলে আর্সেনিকের উচ্চ মাত্রা শুশুকের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। নদীতে নির্মিত বাঁধও বিপদের কারণ। বাঁধের ফলে শুশুকের সংখ্যা ভাগ হয়ে এক একটা প্রবাহে খুবই কমে গেছে। এতে জিন বৈচিত্র্যও কমেছে। ফলে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজার্ভেশন অফ নেচারের (IUCN) রায়ে ১৯৯৬ সালে এরা 'এনডেঞ্জারড' বা বিপন্ন তকমা পেয়েছে। (www.panda.org)

এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরেও গঙ্গার শুশুক সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের তেমন হেলদোল নেই। ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে ডলফিন সংরক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তবে আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কি সত্যিই তেমন উল্লেখযোগ্য? অসরকারি কিছু সংগঠন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বটে। বিদেশী অর্থসাহায্যে পুষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার বা WWF গঙ্গার শুশুকের সংরক্ষণে ১৯৯৭ সালে একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। শুশুকের বাসস্থান দূষিত হওয়ার পাশাপাশি WWF মৎস্য শিকারের প্রক্রিয়াকেও দায়ী করে। সোজা কথায় বলতে গেলে, মাছ শিকারির জালে ডলফিনের ধরা পড়াও তাদের সংখ্যা হ্রাসের একটা কারণ। এই দুটো কারণকে ২০১২ নাগাদ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে WWF। তবে মুশকিল হয় এদের 'এলিট' পন্থী ধ্যান-ধারণা বা কার্যপদ্ধতি নিয়ে। প্রকৃত কাজের তুলনায় 'দেখনাই' অংশটা বড় হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে যে কোনও উদ্যোগই স্বাগত।

এ ব্যাপারে অবশ্য সরকারি একটা সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সম্প্রতি তৈরি 'গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি'-র সভায় গঙ্গার ডলফিনকে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-এর অক্টোবর মাসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এই খবর জানাতে গিয়ে পরদিন সকালে অর্থাৎ ৬ অক্টোবর সংবাদপত্রগুলো বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

তুলে ধরে। যেমন WWF-কে উদ্ধৃত করে তারা জানায় যে বছরে দশ শতাংশ হারে শুশুকের সংখ্যা কমছে। ওদিকে শুশুকের জাতীয় মর্যাদা লাভের পরপরই কিছু রাজ্য যেমন বিহার শুশুক শিকার ঠেকানোর জন্য নজরদারির কথা জানায়। ফল কী হল তা অবশ্য শুশুকসুমারির আগে জানা যাবে না।

ইলিশ প্রসঙ্গ শেষ পাতের জন্য তুলে না রেখে এখনই এনে ফেলি। সাদামাটা কথাটা হল এই যে ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা বাঁধ তৈরি হওয়ার পর থেকেই ইলিশের সংখ্যা কমেছে গঙ্গায়। তবু ইলিশ তো বাজারে তেমন কম আসছে না। আসলে আগের পরিস্থিতিটা এ প্রজন্মের অনেকেই দেখেনি যেখানে ইলিশের প্রচুর ফলন হত। ফলে বাজারে পাওয়া যেত জলের দরে, অন্তত বর্ষার মরশুমে। বছরের সেই সময় অন্তত গরিব মানুষের দারুণ পুষ্টি হত সস্তা ইলিশে। আজ সেটা হওয়া সম্ভব নয়। এ নিয়ে মধ্যবিত্ত চিন্তিত না হলেও বিজ্ঞানীরা চিন্তিত। তাই ব্যারাকপুরের 'সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ক্যাপচার ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট' ইলিশের কৃত্রিম প্রজননে হাত লাগিয়েছে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকেই (ডাউন টু আর্থ, ২৭/০২/১৯৯৫)। সফলও হন বিজ্ঞানীরা। একটা সূক্ষ্ম কথা অবশ্য এখানে বিশদ করা হল না। ফরাক্কা বাঁধ মূলত গঙ্গার উচ্চ প্রবাহে ইলিশের গতি রোধ করেছে। একটা হিসেব অনুযায়ী ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে এলাহাবাদে বার্ষিক ইলিশ ফলন যেখানে ছিল প্রায় কুড়ি টন সেটা ১৯৯৫-এ নেমে আসে এক টনেরও নিচে। এদিকে গঙ্গার নিম্ন প্রবাহ মানে হুগলি নদীতে প্রাণের সুখে মাছ ধরছে শিকারিরা, বলা যায়, ফরাক্কা বাঁধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। হিসেবটা কেমন? ১৯৬০-৬১ বর্ষে যেখানে ইলিশ ফলন ছিল ৬৭৮ টন সেখানে ১৯৮৯-৯০ বর্ষে হয় ৬৫৭৩ টন। ছোট, বড়, ডিমভরা কোনও ইলিশই বাদ দেয়নি ব্যবসায়ীরা। গঙ্গার দুই প্রবাহে এই আচরণের পার্থক্যটা বোঝা দরকার। বেহিসেবী ইলিশ শিকারের ফলে অনেক মরশুমে ইলিশের আকালও দেখেছি আমরা। ২০০৯ থেকে শুরু করে গত পাঁচটা মরশুমে ইলিশের অত্যন্ত কম ফলন ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদের। ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ফিশারিজ সায়েন্সস-এর বিজ্ঞানীদের মতে এই সঙ্কট থেকে বেরোতে হলে 'প্রজেক্ট টাইগার'-এর মত একটা সুসংহত উদ্যোগ চাই (টাইমস নিউজ নেটওয়ার্ক, ০৭/৮/২০০৯)।

সত্যি কথা বলতে কী, ফরাক্কা বাঁধ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের জনজীবনে যে ক্ষতি ডেকে এনেছে তার উপর যবনিকা এখনও পড়েনি। ষাটের দশকের শুরুতে এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে। পূর্বতন পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে সমূহ ঝগড়াঝাঁটি সামলে সে বাঁধ কাজ শুরু করে ১৯৭৫ থেকে। তারপর থেকে শুধু ক্ষয়ের ইতিহাস দুই বঙ্গেই। এর মধ্যে মাছের সংখ্যা হ্রাস অন্যতম। ২০০১ সালে জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি-তে মিয়া আদেল বাঁধ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অবস্থা তুলনা করে দেখান যে কীভাবে কমে গেছে মাছের ফলন। ইলিশের কথা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি ১০৯ ধরনের মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রজাতি এবং উভচরের সর্বনাশের জন্য দায়ী করেছেন ফরাক্কা বাঁধকে। মুসা খান বেসিনে ধরা পড়া পরিচিত মাছের ফলনের তুলনা রয়েছে তাঁর গবেষণাপত্রে। চিতল মাছের ফলন নেমে যায় অর্ধেক পরিমাণে। ওই এলাকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বোয়াল, শোল, কই, ভেদা, খলসে, ট্যাংরা, শিঙ্গি, মাগুর, চ্যাঙ্গ, চাঁদা প্রভৃতি মাছ। রুই, মৃগেল, কাতলার ফলন নেমে যায় সাংঘাতিকভাবে। আবার পরিমল রায়ের লেখা বই 'ইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স অফ দ্য গঙ্গা রিভার সিস্টেম : ইট্স ইমপ্যাক্ট অন অ্যাকোয়াকালচার' (১৯৯৮) ভারতের অংশে এই মৎস্য ক্ষয়ের একটা ছবি দিয়েছে। ইলিশ মাছ লালগোলায় কেমন পাওয়া যেত ১৯৬৩ সালে এবং ১৯৮৯ সালে তার একটা তুলনা উপাদেয় হতে পারে। ১৯৬৩ সালে পরিসংখ্যানটা ছিল ৩৬৩.২৪ টন যেটা ১৯৮৯-তে এসে হল ১৪.৯২ টন। এর পর কী আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে। এ ব্যাপারে অবশ্য একটা মজার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন লেখক। ফরাক্কা বাঁধের কারণে সাগরের ইলিশ গঙ্গার উপরের দিকে প্রবাহে যেতে পারে না সেটা সকলেই জানেন। কিন্তু ফরাক্কার কচিৎ কদাচিৎ খোলা গেটের সুযোগ নিয়ে যারা ঢুকে পড়ে ওই প্রবাহে তাদের কী অবস্থা হয়? এই মাছের দল ফিরতেই পারে না। ফলে ওখানেই সেই সব ইলিশ মাছের বাধ্যতামূলক বসতি গড়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অবশ্যই তাদের প্রজনন পর্ব আসে। তবে ভীষণ কম মৎস্য সংখ্যার কারণে সন্তানদের জীনগত মান নেমে যায়। ইলিশ ছাড়াও ফরাক্কার বাধার কারণে কানপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি জায়গায় কার্প জাতীয় বা অন্যান্য মাছের সংখ্যাও নেমেছে মারাত্মকভাবে।

তবে ফরাক্কা বাঁধকে শুধু দায়ী করলে হবে না। নদীর ক্রমবর্ধমান দূষণ নিঃসন্দেহে জলজ প্রাণী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে কি শিল্প কারখানাই কেবল দায়ী? কখনোই না। যে হিন্দু জনসমষ্টি গঙ্গাকে পবিত্র নদী মানে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে দূষণের ক্ষেত্রে। একটা অন্যতম দূষক অসম্পূর্ণ দহন হওয়া মৃতদেহ। একটা হিসেব অনুযায়ী (www.gits4u.com/water/ganga.htm)বারানসিতে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ হাজার শব দাহ করা হয় গঙ্গার পাড়ে। এগুলোর অধিকাংশই হয় কাঠের চিতায়। শবের সম্পূর্ণ দহন হয় না এই প্রক্রিয়ায়। এই দেহাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়। এমন বহু গরিব মানুষ আছে যারা শব সৎকারের ব্যয় বহন করতে না পেরে সরাসরি তা গঙ্গায় ফেলে দেয়। এ ছাড়া গবাদি পশুর মৃতদেহ তো আছেই। সব মিলিয়ে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত মৃত জীবদেহের পরিমাণ যা দাঁড়ায় তা ভয়াবহ। (gangajal. org.in)

শিল্প কারখানার যোগদান তো অবশ্যই রয়েছে। উত্তর ভারতে হুড়মুড় করে বেড়ে ওঠা ট্যানারি শিল্প গঙ্গাকে একটা ময়লা ফেলার নর্দমা ছাড়া কিছু ভাবেনি। কানপুরের মত জায়গায় যেখানে ট্যানারিগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট সেখানে দূষণ তো সীমাহীন। জৈব পদার্থ এবং অজৈব লবণের ধারাস্রোত অঝোরে মেশে গঙ্গায়। এদের অন্যতম অবদান হল ক্রোমিয়াম ধাতু যা ট্যানিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ লাগে প্রক্রিয়াকরণে, বাকি অংশের স্থান গঙ্গার বুকে।

গঙ্গাকে দূষিত করে এমন বহু ছোট-বড় ঘটনা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। ২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এর কাছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের পাইপলাইন ফেটে বিপুল

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

পরিমাণ খনিজ তেল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গঙ্গার জলজ প্রাণী সহ ওই এলাকায় বসবাসকারী প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবনে সঙ্কট নেমে আসে যদিও নির্মাণের সময় ওই পাইপলাইন ছিল নদীর প্রবাহ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে কিন্তু নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করায় পাইপের ভাঙন ঘটে। (goldenlotus.instablogs.com/entry/death-of-aquatic-life-in-ganga) এই সব দূষণের ফলাফল সরাসরি গঙ্গার প্রাণীদের দেহে ধরা পড়ে। যেমন এই হুগলি নদীর আণুবীক্ষণিক সবুজ শৈবাল বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন যে পাঁচটা ভারী ধাতু যথা ক্রোমিয়াম, তামা, নিকেল, সিসা এবং দস্তা নিজের দেহে প্রচুর পরিমাণে ধারণ করছে তা সাবাতা এবং নায়ার ১৯৯৫ সালে তাঁদের গবেষণাপত্রে দেখান। সাইক্লোপ্স এবং ড্যাফনিয়ার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব বা প্রাণী, যাদের অনেকগুলো মাছের খাদ্য, তারা দস্তার ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। ড্যাফনিয়া কমে যাওয়ার কারণ জলে মেশা অতিরিক্ত দস্তা। চিংড়ির মত পোকা থেকে শুরু করে মাছের দেহেও ভালো পরিমাণে জমা হয় এই সব ভারী ধাতু। মাছের কানকো-তে কিছুটা এবং বৃক্কে বিপুল পরিমাণে ধাতু জমা হতে দেখা গেছে। যে সব মাছ স্থান পরিবর্তনে সক্ষম অর্থাৎ যাযাবর হতে পারে তারা এই দূষণ হয়ত সামান্য এড়াতে পারে। কিন্তু এড়িয়েই বা যাবে কোথায়? গোটা গঙ্গা জুড়েই তো দূষণ! তা ছাড়া এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিযানের ফলে মাছেদের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটে এবং মাছের সংখ্যা কমে আসে। (তথ্য সূত্র : River Pollution in India and its Management, বইয়ের লেখকদ্বয় কৃষ্ণণ গোপাল এবং অনিল কুমার আগরওয়াল, ২০০৩)

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গঙ্গায় ক্ষতিকর ব্যাক্টিরিয়া ও পরজীবী অবশ্য বেড়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে। সিস্টোসোমিয়াসিস বা বিলহার্জিয়া নামে পরিচিত রোগের বাহক হল সিস্টোসোমা ম্যানসনি নামে পরজীবী। এদের সংখ্যা গঙ্গার জলে বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মলমূত্র থেকে কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়াও মিশেছে অঝোরে। একশো মিলিমিটার জলে পাঁচশো কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়ার উপস্থিতিকে নিরাপদ সীমা বলে ধরা হয়। বারানসিতে গঙ্গার জলে পরিমাণটা হল ষাট হাজার। অর্থাৎ নিরাপদ সীমার তুলনায় একশো কুড়ি গুণ উপস্থিতি। তবুও গঙ্গা পবিত্র? এই কথার অবশ্য একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রয়েছে। গঙ্গার জলে এক ধরনের ভাইরাস রয়েছে যা ব্যাক্টিরিয়া খেয়ে নেয়। এই ভাইরাসের নাম ব্যাক্টিরিওফাজ। এদের দাপটে ক্ষতিকর ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা কমে এবং তার ফলে মহামারির অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। বিদেশী বেতারের অনুষ্ঠানেও এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাক্টিরিওফাজের উপস্থিতি সত্ত্বেও হুগলির বুকে কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়া এত বেড়ে গেছে যে বিজ্ঞানীরা হুগলির জলে স্নান করাকেও নিরাপদ মনে করছেন না। জল পান তো দূরের কথা। অতঃ কিম?

Ref :

1) David Dudgeon, 'The Ecology of Tropical Asian Rivers And Streams In Relation To Biodiversity Conservation, Annu. Rev. Ecol.Syst. 2000.31:239-63;

2) www.wordfocus.com;

3) en.wikipedia.org/wiki/Ganges

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা — কিছু দায়িত্ব

বেবি বসু (গুপ্ত)

ভূমণ্ডলের তিনটি উপমণ্ডলের অনুকূল সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ জীবমণ্ডল (Biosphere) যা খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-জালিকার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে 'বাস্তুতান্ত্রিক' ভারসাম্য (Ecological balance)। মানুষের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আজ জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) একদিন মনুষ্য নামক প্রজাতির বিপদ ডেকে আনবে। সেই কারণে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের এক যোগে এই বৈচিত্র্যময় জীবকূলকে রক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এক বিশেষ আলোচনায় পরিবেশের অত্যন্ত সহজ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ('..everything that isn't me), যে সংজ্ঞা অনুসারে আমাদের চারপাশের সব বস্তুজগৎ (abiotic elements) ও জীবজগৎ (Biotic elements)-কেই সুরক্ষিত করতে হবে — সবুজ শৈবাল থেকে মেহগেনি বৃক্ষ বা ভূমিলতা (কেঁচো) থেকে নীল তিমি পর্যন্ত সকলের বাস্তুতান্ত্রিক সুরক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে....' আদর্শ এখানে পালনীয়। তেমনই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সেই আশ্চর্য বালক যে শুনতে পেয়েছিল কালের পথের সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছের অন্তরের কথা 'আমি থাকব, আমি বাঁচব...'। স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই কচি চারাগাছকে পদদলিত করে নিছক অগভীর আনন্দ লাভের জন্য; কিম্বা পুকুরের ধারে আশ্রিত ব্যাঙের শরীরে অহেতুক ঢিল ছুঁড়ে মারে বা কেঁচোকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে। কিন্তু তাদের বুঝতে হবে এবং এই বিজ্ঞানের যুগে জন্মেছে বলেই আরও জানতে হবে যে ব্যাঙ পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের (Pond ecosystem) উল্লেখযোগ্য অংশ। আবার কেঁচো কীভাবে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যতালিকায় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যে নাইট্রেজেন সরবরাহ করে নীরবে। সুতরাং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজন গাছপালা জীবজন্তুর প্রতি সামান্য ভালবাসা।

দেখা গেছে তাৎক্ষণিক অর্থ লাভের আশায় কীভাবে আসামের জঙ্গলে হাতি, গণ্ডার, সুন্দরবনের বাঘ চোরাকারবারীদের হাতে নিহত হয়ে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। মেরুপ্রদেশের তুষার ভূমি সিল মাছ হত্যার রক্তে রঞ্জিত হয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মানুষের লোভ ও নিষ্ঠুরতা। সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক আইন সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে গভীর সমুদ্রে চলছে তিমি শিকার — যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ কথা সকলেই জানেন যে জলজ প্রাণী-বৈচিত্র্য সুরক্ষা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। নানান স্তরের শিক্ষার্থীরা যদি সংগঠিত উদ্যোগে এই সকল বিষয় নিয়ে দেশ তথা আন্তর্জাতিক দরবারে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে তবে যুব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রাখবে এক মহৎ আদর্শ। মানুষের মতো সকল জীবেরই ধর্ম হল জন্মগ্রহণ, জীবনযাপন ও পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনের গতিকে অব্যাহত রেখে মরণশীলতা। এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সকলেই যাতে সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক। অনুজীব থেকে বৃহৎ জীবকূল সকলেই এই বসুন্ধরার সন্তান। এদের সকলেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

এর পর ছয়ের পাতায়

পাঁচের পাতার পর

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আন্তর্জাতিক বার্তা সমূহ

১৯৭৪ শুধু একটি পৃথিবী
১৯৭৫ মনুষ্য বসতি সমূহ
১৯৭৬ জল: জীবনের মূল রসদ
১৯৭৭ ওজোন স্তর, পরিবেশ ভাবনা, ভূমিক্ষয় এবং মাটির উৎকর্ষতা হ্রাস
১৯৭৮ ধ্বংস ব্যতীত সামগ্রিক উন্নতি
১৯৭৯ আমাদের শিশুদের শুধু একটিই ভবিষ্যৎ
১৯৮০ নতুন দশকের নতুন শপথ - ধ্বংস ব্যতীত উন্নতি
১৯৮১ ভৌম জল, মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি
১৯৮২ স্টকহল্‌ম সমাবেশের ১০ বছর পূর্তি (পরিবেশ ভাবনার পুনর্নবীকরণ)
১৯৮৩ ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তিকরণ : অম্লবৃষ্টি এবং শক্তি
১৯৮৪ মরুকরণ
১৯৮৫ যুবক সমাজ এবং পরিবেশ
১৯৮৬ শান্তির জন্য একটি গাছ
১৯৮৭ পরিবেশ এবং আশ্রয় — একটি ছাদের অধিক
১৯৮৮ যখন মানুষ পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয় তখন উন্নতি বজায় থাকে
১৯৮৯ বিশ্ব উষ্ণায়ন, বিশ্ব সতর্কতা সংকেত
১৯৯০ শিশু ও পরিবেশ
১৯৯১ জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা
১৯৯২ একটি পৃথিবী, প্রযত্ন এবং অংশীদারিত্ব/বন্টন
১৯৯৩ দারিদ্র এবং পরিবেশ দুষ্টচক্রের ভাঙন
১৯৯৪ একটি পৃথিবী, একটি পরিবার
১৯৯৫ আমরা সাধারণ মানুষ : বিশ্ব পরিবেশের জন্য সংঘবদ্ধ
১৯৯৬ আমাদের পৃথিবী, আমাদের অভ্যাস, আমাদের ঘর
১৯৯৭ পৃথিবী জীবনের জন্য
১৯৯৮ পৃথিবীতে জীবনের জন্য সমুদ্রকে রক্ষা কর
১৯৯৯ আমাদের পৃথিবী, আমাদের ভবিষ্যৎ - একে রক্ষা কর
২০০০ পরিবেশ শতক - কাজ করার সময়
২০০১ সারা পৃথিবী জুড়ে জীবনের সাথে সংযোগ
২০০২ পৃথিবীকে একটি সুযোগ দাও
২০০৩ জলের অভাব - দুই শতকোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ
২০০৪ সমুদ্র চাই - জীবিত অথবা মৃত
২০০৫ পৃথিবীর জন্য পরিকল্পনা - শহরকে সবুজ কর
২০০৬ শুষ্ক অঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত কোরো না
২০০৭ বরফ বিগলন - একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
২০০৮ কার্বনডাইঅক্সাইড - কার্বন মিতব্যয়িতার দিকে তাকিয়ে কিছু অভ্যাস পরিবর্তন
২০০৯ পৃথিবী তোমাকে চায় - জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য সংঘবদ্ধ হও
২০১০ বহু প্রজাতি, একটি পৃথিবী, একটি ভবিষ্যৎ

পরিবেশ পঞ্জিকা

দিবস	তারিখ
বিশ্ব জলাশয় দিবস	ফেব্রুয়ারি, ২
বিশ্ব অরণ্য দিবস	মার্চ, ২
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	মার্চ, ৭
বিশ্ব জল দিবস	মার্চ, ২২
বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	মার্চ, ২৩
বিশ্ব হেরিটেজ দিবস	এপ্রিল, ১৮
বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস	এপ্রিল, ২২
আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস	মে, ২২
বিশ্ব পরিবেশ দিবস	জুন, ৫
মরুকরণ ও খরা রোধের জন্য পালিত আন্তর্জাতিক দিবস	জুন, ১৭
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস	জুলাই, ১১
অরণ্য সপ্তাহ	জুলাই, ১৪-২০
ওজোন স্তর সংরক্ষণের জন্য পালিত আন্তর্জাতিক দিবস	সেপ্টেম্বর, ১৬
সবুজ উপভোক্তা দিবস	সেপ্টেম্বর, ১৮
বিশ্ব বসতি দিবস	অক্টোবরের প্রথম সোমবার
প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য পালিত আন্তর্জাতিক দিবস	অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ
বিশ্ব পশু দিবস	অক্টোবর, ৪
ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা দিবস	ডিসেম্বর, ২
আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস	ডিসেম্বর, ১১

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যপ্রণালী

- বিভিন্ন গ্রাম, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা।
- স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান (যেগুলি সারা এপ্রিল মাস ও তারপরও বেঁচে থাকে)।
- পরিবেশ সংক্রান্ত মেলা, প্রদর্শনীর আয়োজন।
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা।
- পরিবেশ সংক্রান্ত নুক্কাড় নাটক, লোকনৃত্য ও গান এবং সংগীতের আয়োজন।
- বিদ্যালয়ে গাছের নার্সারি গঠন।
- বিদ্যালয়ে বিতর্কসভা ও আলোচনা সভার আয়োজন।
- প্রকাশ্যস্থানে পরিবেশ সংক্রান্ত পোস্টার লাগানো।
- পুনর্নবীকরণযোগ্য বস্তু এবং পুনর্নবীকৃত পদার্থ থেকে উদ্ভূত বস্তুর নির্বাচন।
- সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে ফ্লুরোসেন্ট এবং LED বাল্ব ব্যবহার।
- জৈবখাদ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৫৭৫৩৬৪; ৯৮৩৬৫০৮০০৩ ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in